Rs. 2.00

মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA

প্রবীণবার্তা

MONTHLY

মাসিক

Vol : X Issue : VII, 15th, October, 2021 কার্তিক, ১৪২৮, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

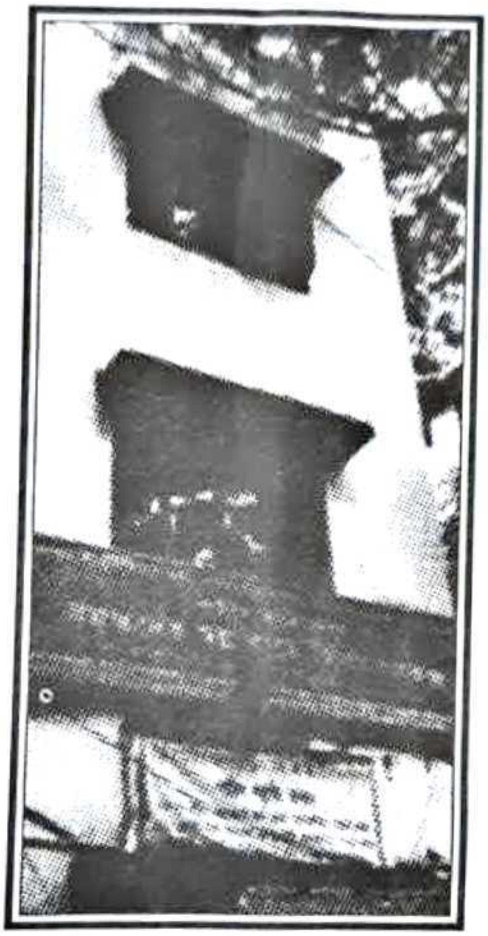

শহীদ স্মৃতি ভবন

৩৯২এ, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড

কলকাতা - ৭০০ ০৪৫

বিশেষ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

এই মাসটি উৎসবের মাস। যতই করোনা চোখ রাঙাক না কেন, 'মন্বন্তরে মরিনি আমরা/মারী নিয়ে ঘর করি' - তাই উৎসবে মেতে উঠব। তবে সাবধান হতে ভুলব না। মাস্ক পড়ব, নিয়মিত স্যানিটাইজার ব্যবহার করব এবং অবশ্যই ভিড় এড়িয়ে চলব।

এবার প্রবীণবার্তা বিশেষ সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। এতে আমরা বিগত দিনের শ্রম আন্দোলনের বিপ্লবীদের সঙ্গে বাংলার দুই বিখ্যাত মনীষীকেও স্মরণ করেছি। এছাড়া প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও ভ্রমণ কাহিনিতেও সাজাবার চেষ্টা করেছি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে।

১ অক্টোবর 'বিশ্ব প্রবীণ দিবস' হিসাবে সারা বিশ্বে পালিত হয়। আমাদের দেশে নানা সংগঠন প্রবীণদের দাবি-দাওয়া নিয়ে উচ্চকিত হয়। কিন্তু, সারাবছর ভুলে থাকব, অবহেলা করব আর সাড়ম্বরে বিশেষ একটা দিন পালন করব— তাতে কি প্রবীণদের সমস্যার প্রকৃত সমাধান হয়! সবাই একটু ভাবুন। তাছাড়া এই একটা মাত্র দিবস, যেটা যাদের জন্য চিহ্নিত শুধু তারাই পালন করেন। নবীনরা কখনই উৎসাহ দেখান না। অথচ 'শিক্ষক দিবস' বা 'মাতৃ দিবস' পালন করেন যথাক্রমে ছাত্রছাত্রীরা ও পুত্রকন্যারা, কদাচ শিক্ষক বা মায়েরা নন।

২ অক্টোবর জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির জন্মদিন, যাকে 'পূজার ছলে শুধু ভুলেই থাকি।'

ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

বেথুন এর পক্ষ থেকে শারদীয়ার আগাম শুভেচ্ছা রইল।

স্মৃতিতে উজ্জ্বল তাঁরা—জলন্ত, অমর

(১ম ভাগ)

পেলব মুখার্জী

স্বাধীনতা দিবসের সকালে হঠাৎই দেখা হয়ে গেলো মণীন্দ্র আশের সাথে, ন্যাশনাল ইন্সট্রুমেন্টের প্রাক্তণকর্মী, লেখালেখি করেন। গ্রামে মাসিক কাগজের সাথে যুক্ত। চায়ের দোকানে চা খেতে খেতে ভাবনাটা এল। এমনিতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বাড়িতে বন্দী অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি। তার মাঝে লেখার জন্য মণীন্দ্র বাবুকে বলায় তিনি রাজী হয়ে গেলেন। তার সাথে আলাপ খুব বেশি নয় কিন্তু তার প্রতিভা আছে দেখলাম। জীবনভর কত লোক কত ভাবে বিভিন্ন কাজে যুক্ত থেকে সমাজ পরিবর্তনের জন্য অহোরাত্র পরিশ্রম করে চলেছেন, পরিবর্তে তারা কিছুই চান না। মুখ বুঁজে কাজ করে যান শুধুমাত্র।

কদিন ধরে ভাবছি প্রবীন ব্যক্তির জন্য কিছু লিখতে হবে। তখনই মনে হলো হাতের কাছেই তো বিষয় আছে, কোন কাল্পনিক বিষয় নয়, যারা কাজ করছেন কিন্তু নাম চাননি কোনোদিন, তাদের স্মরণ করে লিখব। সেই ভাবনা থেকে এই লেখা।

প্রথমেই মনে পড়ছে অমলেশ বিশ্বাসের কথা যাকে আমরা বাদল বিশ্বাস বলে চিনি বা জানি। আমার তার সাথে আলাপ হয় রবীন চৌধুরী মারফৎ। Assembly Dept.-এ কাজ করতেন। সদাহাস্য, অমায়িক ব্যবহার, পাশের পোদ্দারনগরে বসবাস, সেখানে খুবই পরিচিতি। আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলের সাথে যোগাযোগ ছিল। উদ্বাস্তু আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। জয় ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দুঃসময়ে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯৬৩ সালের ধর্মঘটে পোদ্দারনগর ও কাটজুনগর অঞ্চলে ইউনিয়নের যে কাজ হয়েছিল তাতে আমাদের কার্যকলাপ আরও মজবুত হয়। কোম্পানির হামলার সময়ে পোদ্দারনগর ও কাটজুনগর অঞ্চলে প্রতিটি ঘরে জয়া শ্রমিকরা নিজেদের বাড়ি বলে আশ্রয় লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। আমরা যাদের সাহায্য নিয়ে ছিলাম তাদের অন্যতম হলেন বাদল বিশ্বাস, সাথে ছিলেন অম্বর রায় চৌধুরী, সুনীল নাথ ও আরও অনেকে। আমরা বাদল বাবুকে ইউনিয়নের কাজে সবসময় পেয়েছি। এমনকি চাকুরি থেকে অবসর নেওয়ার পরও কোনো কাজে কখনও আপত্তি করেননি। পার্টির মুখপত্র বিলির কাজে তার সাহায্য চাইলেও তিনি এক কথায় রাজি হয়ে যান। এমন একজন ব্যক্তিকে হারানো যে কী কষ্টকর তা লিখে বোঝানো যাবে না।

মনে পরে, কমঃ বিমল নাগের কথা। কমঃ বিমল উষা সেলাই মেশিনের ক্যান্টিনে কাজ করতেন, তিনটি পুত্র-কন্যা নিয়ে সস্ত্রীক উষা কোয়ার্টারে বসবাস করতেন। বর্তমানে যেখানে ইউনিয়নের অফিস সেখানে চারতলায় বাড়িতে ইউনিয়ন ভাড়া ছিল একটি মাত্র ঘরে। রাত ১২.৩০ মিনিট পর্যন্ত, যখন যাবেন বিমল নাগকে পাবেনই। ইউনিয়নের কাগজপত্র রক্ষা করার কাজে তিনি অনন্য নজির রেখে গেছেন। স্বাক্ষরতার

আন্দোলনে যুক্ত হয়ে প্রাথমিক পাঠ আরম্ভ করেন এবং পরে ইউনিয়ন-কার্যকরী সমিতিতে যোগদান করেন। আমরা যে যৌথ উদ্যোগের কথা বলি তার উজ্জ্বল নক্ষত্র কমঃ বিমল নাগ। কত কথা বলার আছে— সব তো বলা যাবে না। মনে পরে, কোয়ার্টার থেকে বিতাড়িত হয়ে ইউনিয়নের শরণাপন্ন হন এবং আমরা ইউনিয়ন থেকে ভাড়া করা গার্ডেনরীচের বাড়িতে তাকে থাকার ব্যবস্থা করে দিই। সেখানে অন্যান্য কমরেডরাও বসবাস করতেন। তার আর্থিক অবস্থা এত শোচনীয় হয়ে পরে যে পুত্র-কন্যার দুবেলা খাবারও ব্যবস্থা করতে পারত না। গল্প কথা নয়, চাক্ষুষ দেখা। দুকেজি আলু কিনে শুধু আলু সেদ্ধ ও নুন দিয়ে খেয়ে যে আদর্শে অবিচল থাকা যায় তার উদাহরণ হল কমঃ বিমল নাগ। পরবর্তীতে তাকে ITC-তে ক্যান্টিনের কাজে নিযুক্ত করায় সেখানেও ইউনিয়নের নেতৃত্বে উন্নত হয়েছিলেন। এরপরে জয়ার চাকুরিতে পুনরায় নিয়োগ হলেও তিনি আর ফিরে আসেন নি। ITC-তে কর্মরত থাকেন, তাকে আমরা বেথুন থেকে সংবর্ধনা জানিয়েছি। তার মৃত্যুতে আমরা সবাই খুবই শোকাহত।

মনে পড়ে রাখাল চৌধুরীর কথা। Assembly Dept.-এ কাজ করা রাখাল চৌধুরী আদর্শে অবিচল থেকে নেতৃত্বে উঠে এসে লোকাল কমিটি জোনাল কমিটি পর্যন্ত উন্নত হয়ে ইতিহাস রচনা করেছেন। যে চারটি শিশু নিয়ে সংগ্রাম করেছেন, তারা দাদার সন্তান, নিজের বিয়ের কথা চিন্তাই করেননি। কে পি রায় লেন থেকে বিতাড়িত হয়ে প্রথমে বেহালা, পরবর্তীতে আমার বাড়িতেও আশ্রয় নিয়ে পার্টির কাজকর্ম চালিয়ে গেছেন। পরে সেখানেই অন্যত্র ভাড়া বাড়িতে পরিবারের সকলকে রেখে পার্টির আশ্রয়ে খিদিরপুরে রাম কর্মকারের বাড়িতে আমার সঙ্গে বসবাস করতে শুরু করেন। কখনও নিজের কথা বা বাড়ির কথা বলতেন না। ডেকার্স লেনে ৮০ পয়সা মিল খেয়ে / না খেয়ে দিন কাটালেও সদাহাস্য রাখাল নীরবে পার্টির/ইউনিয়নের কাজকর্ম করে গেছেন।

সুদর্শন পানি - সুদূর উড়িষ্যা থেকে কাজের জন্য আসা সুদর্শন পানি গোবিন্দপুরে থাকতেন। জয়ার জবিং শাখার কাজ করতে করতে ইউনিয়নের সংস্পর্শে আসেন এবং ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলনের মাধ্যমে ইউনিয়নে যোগদান করেন। স্থানীয় বস্তিতে কাজ করার সূত্রে ঢাকুরিয়া অঞ্চলে আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। পরবর্তীতে কারখানা বন্ধ হওয়ার আগে কোম্পানী তাকে ছাঁটাই করে দেন, সংগ্রাম করেও তাকে কাজে পুনরায় বহাল করা যায়নি। পরে তিনি উড়িষ্যায় গিয়ে পার্টিকে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সবসময়ই ইউনিয়নের সাথে যোগাযোগ রেখে চলতেন। পরিবার আর্থিকভাবে অচল হয়ে পড়ে, ইউনিয়ন সভাপতির সঙ্গে যোগাযোগ করে পুত্রকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। দীর্ঘদিন বেকার থাকার পর কলকাতা পৌরসভায় ঠিকা-মজদুর হিসাবে কাজে যোগ দেন।

কমঃ নীরেন ঘোষ - কমঃ নীরেন ঘোষকে সবাই জানেন। জয়া কারখানায় কাজ করার সুবাদে ইউনিয়নের সাথে যোগাযোগ। উত্তর কলকাতায় শ্যামবাজার মোড়ের নিকট পৈতৃক বাড়িতে বসবাস করতেন। মেট্রোরেল সম্প্রসারণের জন্য তাঁর বাড়ি মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ অধিগ্রহণ করেন। অতিমূল্যবান জমি বাবদ ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন মাত্র কয়েক হাজার টাকা। এনিয়ে পার্টিতে আলোচনা ও ছোটাছুটি করেন কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি। ফলে চাপে পড়ে বাড়ি ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং হতাশ হয়ে পড়েন। ঠিক এ সময়ে ব্যক্তিগতভাবে

আমি বলি কলকাতায় ভাড়া দিয়ে তোমার পক্ষে বসবাস করা অসম্ভব। আমার মতে পশ্চিমবঙ্গে জমির উপর চাপ এবং মূল্যবৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই নিজের চেষ্টায় ছোট হলেও পরিবার নিয়ে বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টাই শ্রেয় বলে মনে হয়। নীরেন ঘোষ তা মেনে নেন এবং রাজপুরের নিকট চার কাঠা জলাজমিতে নিজের বাসস্থান তৈরি করেন। এতো গেল বাড়ি / জমির কথা। আমাদের নীরেন ঘোষ শুধুমাত্র ইউনিয়নের হিসাবপত্র নয়, ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী হিসাবে প্রতিটি কর্মসূচীতে নেতৃত্বের ভূমিকায় কাজ করে গেছেন, যা ভুলবার নয়। তাঁর আত্মত্যাগ এবং দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে ভূমিকা ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য, যা সহজে ভোলা যায় না।

এভাবে কতজনের কথা বলব। জমা শ্রমিকদের যে আত্মত্যাগের ইতিহাস রচিত হয়েছে তা শুধু লিখে বা বলে শেষ করা যায় না। ১৯৬৩ সাল থেকে ১ বার ধর্মঘটে অংশ নিয়েছিল শ্রমিকরা। তারপর প্রতি ৫ বছর অন্তর ৬ মাস বা তার বেশি সময় ধরে লক-আউটের বলি হতে হয়েছে শ্রমিকদের। বহু আন্দোলন করতে হয়েছে। শেষ হল মালিকের বি-আই-এফ-আরের অন্তর্ভুক্তির মধ্যে দিয়ে। এ লড়াই ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকরা যে ঐক্য ও সংগ্রামের নীতি অনুসরণ করেছিল তাকে সারাভারতের শ্রমিক আন্দোলন দু' হাত তুলে আশীর্বাদ করেছে। সারা বাংলার শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলনকে দিশা দেখিয়েছে একথা বলা যায়।

মালিক পক্ষের ষড়যন্ত্র এবং মুষ্টিমেয় শ্রমিকের বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যেও যে নীতি ও আদর্শের পথে সংগ্রাম করেছেন তাতে ইউনিয়নের ১৫০০ জন তালিকাভুক্ত স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা ভুলবার নয়। এ আন্দোলনের সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের অগ্রনিদের এক তালিকা দেখলেই আন্দোলনের ব্যাপকতা বোঝা যাবে। উষা সেলাই মেশিন, উষা ফ্যান এবং সেলস ইউনিট মিলিয়ে যাদের একডাকে সবাই চেনে বা জানে তাদের নাম নিম্নে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি। আমার স্মরণে যা আছে তাছাড়া অনেকেই রয়ে গেছেন, যা চিহ্নিত করতে পারেন একমাত্র সাধারণ শ্রমিকরা, যারা হলো আসল পথ প্রদর্শক। যতটা সম্ভব একবারে সামনের সারিতে যারা ছিলেন তাদের নাম উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। এর মধ্যে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় স্তরে উন্নীত নেতৃত্বও আছেন।

স্মৃতিতে উজ্জ্বল তাঁরা - জ্বলন্ত অমর

ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত	বীরেশ্বর চ্যাটার্জী	জয়কিষাণ তেওয়ারী	রবিন ঘোষদস্তিদার
সুশোভন রায়	অতীন মিত্র	সনৎ চক্রবর্তী	রাখাল চ্যাটার্জী
হরিদাস মালাকার	রামায়ণ পান্ডে	সুবল সখা খান	সিতাংশু সেনগুপ্ত
বিমল চ্যাটার্জী	সওদাগর রায়	মাখনলাল ঘোষ	রথীন মিত্র
সত্য ঘোষ	মোজাহেদ হোসেন	বিমল নাগ	বাদল বিশ্বাস
অমর নাগ	শশীকান্ত মোদক	মৃত্যুঞ্জয় বসু	বাদল মুখার্জী

বাদল চ্যাটার্জী
সুদর্শন পানি
পরমেশ সেন
প্রফুল্ল দাস
রণজিৎ বোস
বিমল বোস
জয়দেব সামন্ত
সুনীল নাথ
মনোরঞ্জন তালুকদার
প্রণব কুমার সরকার
অলোক হালদার
যতীন পাল

সুনীল দে
নিত্যানন্দ পাল
রমেন ভট্টাচার্য
সুনিল দাস (ঢাকুরিয়া)
মনোজ রায় চৌধুরী
দীপেশ মিত্র
রথিন পাল
রতন ঘোষ
পরিমল লাহিড়ি
অমর নাগ
এস. পি. দত্ত
সুশীল রায়

অজয় মজুমদার
বীরেন মজুমদার
অমর নাগ
রঘুনাথ রায়
প্রিয়ব্রত সেন
সুরেশ কুমার দীক্ষিত
রাখাল চৌধুরী
সীতাংশু রায়
নীরজ নাথ সরকার
রমেশ কুন্ডু
পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য
অজিত মন্ডল

রাইমোহন বসাক
পরিমল ভট্টাচার্য্য
জে. বি. চ্যাটার্জী
রামানন্দ মিশ্র
কৃপাল সিং
জলধর খাঁ
পশুপতি ঘোষ
শান্তি ব্যানার্জী
দয়াময় চক্রবর্তী
ক্ষিতিশ চ্যাটার্জ্জী
সুনিল দাস (বেলঘরিয়া)

[আগামি সংখ্যায় সমাপ্ত]

বার্ধক্যে মনের যত্ন

মৃগেন গাঁতাইত

দেহের বার্ধক্য শরীর বিজ্ঞানের প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী একটা স্বাভাবিক বাস্তব সমস্যা। শরীরটাকে ক্রমশঃ কম কর্মক্ষম করে নেয়। সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নানাবিধ ওষুধ, পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। তার সঙ্গে যুক্ত আছে মনের বার্ধক্য। যা নিয়ে চর্চা হয়, তবে কম। মনের বার্ধক্যের প্রধান বিষয় হল মনের প্রসারণশীলতা কমে যাওয়া। গাছের শুকনো ডালের মতন অনমনীয়তা। মনের বার্ধক্য দেহের বার্ধক্যের চাইতেও কষ্টকর, কারণ তা সংসারের সামগ্রিক পরিবেশকে অসহনীয় করে তুলতে পারে। মনের বার্ধক্যকে নিজের চেষ্টায় অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। যে যে বিষয়ে জোর দিতে হবে তা হল ঃ

ক) কিছু বিষয়কে উপেক্ষা করার অভ্যাস করতে হবে। গৌতম বুদ্ধের এক কাহিনি আছে। একদিন রাস্তায় যেতে যেতে এক ব্যক্তি বুদ্ধকে খুব খারাপ কথা বলেই যাচ্ছিল। বুদ্ধ কোনো উত্তর দিচ্ছিলেন না। কিছুক্ষণ পরে এক শিষ্য বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি কেন উত্তর দিচ্ছেন না। বুদ্ধ তখন লোকটির কাছে গিয়ে বললেন, আচ্ছা, তোমাকে যদি কেউ কোন কিছু দেয় অথচ তুমি তা না নাও, তাহলে জিনিসটা কার কাছে থাকবে? লোকটি বলল যার জিনিস তার কাছেই থাকবে। বুদ্ধ বললেন আমাকে বলা তোমার ওপরের কথাগুলো আমি নিচ্ছি না। এবার লোকটি লজ্জিত হল।

খ) ইগোকে (অহংবোধ) অনেক নীচু মাত্রায় রাখতে হবে। কারণ, বেশি বয়সে নিজ জনদের কাছে ইগোর প্রয়োজন কম। বুদ্ধকে একজন জিজ্ঞেস করেছিল— আপনি নীচে মাটিতে বসেন কেন। বুদ্ধ বলেছিলেন তাহলে আর পড়ে যাবার ভয় নেই।

গ) অন্যকে দোষারোপ না করে বোঝার চেষ্টা করতে হবে কেন অন্যজন ভুল করে ফেলল। তাকে সংশোধন করতে আন্তরিকভাবে সাহায্য করা দরকার।

ঘ) মন ভাল থাকার হরমোন বা নিউরোট্রান্সমিটার হল ডোপামিন। শারীরিক পরিশ্রমে ডোপামিন নিঃসৃত হয়। তাই কিছুটা হলেও শারীরিক পরিশ্রম করা ভাল। বাড়ির কাজে সাহায্য করলেও পরিশ্রম হয়। বাসন মাজা, ডান্ডা দিয়ে ঘর ঝাড়া, হালকা বাজার করা এই কাগজগুলোকে মনের আনন্দে করা ভাল। পাকা কলা ডোপামিন বাড়াতে সাহায্য করে।

ঙ) নিজের কৈশোর যৌবনে তখনকার বয়স্কদের সঙ্গে যেমন পছন্দ অপছন্দ নিয়ে সংঘাত হত, তেমনি বর্তমান তরুণদের সঙ্গে মতের সংঘাত হওয়াটা স্বাভাবিক হিসাবে গ্রহণ করার অভ্যাস করতে হবে।

শরীরের মতনই মনের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন, বিশেষত বার্ধক্যে।

শ্রী অরবিন্দ ঃ বিপ্লবী ও লেখক

মণীন্দ্রনাথ আশ

হুগলি জেলার কোন্নগরের কৃতি সন্তান ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ (ডাঃ কে. ডি. ঘোষ) ইংল্যান্ড প্রত্যাগত খ্যাতনামা চিকিৎসক। মৃত্যু— ১৮৯৩। স্বনামধন্য সমাজহিতৈষী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব রাজনারায়ণ বসুর কন্যা স্বর্ণলতার সঙ্গে কৃষ্ণধনের বিবাহ হয়। এঁদেরই সন্তান— মনমোহন, অরবিন্দ, বারীন, সরোজিনী। অরবিন্দের জন্ম কলকাতায় থিয়েটার রোডের মামার বাড়িতে (এখন অরবিন্দ ভবন) ১৮৭২ সালের ১৫ আগস্ট। পৈতৃক নিবাস— ঘোষপাড়া, কোন্নগর, হুগলি।

একাধারে তিনি ছিলেন কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, অনুবাদক, বহু ভাষাবিদ, রাজনৈতিক নেতা, দার্শনিক ও যোগী। অরবিন্দের ভারতীয় রাজনীতির আসরে আবির্ভাব একটি যুগান্তকারী ঘটনা। শিক্ষার জন্য প্রথমে কিছুদিন দার্জিলিং পরে ৭ বছর বয়সে বিলাতগামী হন। শিক্ষান্তে ১৮৯৩ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন। কলেজে যোগদান অধ্যাপক রূপে। পরে ওই কলেজের অধ্যক্ষ হন। এক সময় তিনি মহারাষ্ট্রের গুপ্ত বিপ্লবী দলের নেতা ঠাকুর সাহেবের কাছে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত হন। কিছুদিন পরে স্বনামধন্য রাজা সুবোধ মল্লিকের অনুরোধে কলকাতায় এসে ইংরেজি ''বন্দেমাতরম্'' পত্রিকার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। ১৯০৫ সালে শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁর ''সন্ধ্যা'' পত্রকা প্রকাশ করতে থাকেন। অরবিন্দ প্রসঙ্গে ''সন্ধ্যায়'' তিনি লেখেন— ''মানস সরোবরে অরবিন্দ অমলশুভ্র অরবিন্দ দেখিয়াছ কি?— ভারত মানব সরোবরে প্রস্ফুটিত শতদল...। আমাদের এই অরবিন্দ জগৎ দুর্লভ। হিম-শুভ্র-বর্ণে ইনি ফিরিঙ্গির সভ্যতার মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া, ইহলোকের সুখ-স্বাদ বিসর্জন দিয়ে মায়ের ছেলে অরবিন্দ— ''বন্দেমাতরম্'' পত্রের সম্পাদনায় ব্রতী হইয়াছেন। ইনি ঋষি বঙ্কিমের ভবানন্দ, জীবনানন্দ, ধীরানন্দ স্বামী।''

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বে বিপ্লবীদের একটি ধারা কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলনের সমান্তরাল রেখায় চলে। এই বিপ্লবীদের বলা হত ''জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী''। ১৮৯৬ সালে ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে এলেন অরবিন্দ ঘোষ এবং তখন থেকেই তিনি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক চিন্তাকে দার্শনিক এবং নৈতিক আচরণে নবরূপ দান করেন। প্রকৃতপক্ষে ১৮৯৬ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত অরবিন্দ ঘোষ এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা। অরবিন্দ বিশ্বাস করতেন ধর্মের উৎস থেকে শক্তি সঞ্চয় করে ভারতে জনসাধারণ সমগ্র জাতির উন্নতির জন্য যথার্থভাবে পশ্চিমী জ্ঞান ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন এবং প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে। তাই তিনি ভারতের আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। বৈপ্লবিক আন্দোলনের শুধু প্রথম পর্বেই নয় পরবর্তী কালেও অরবিন্দের প্রভাব ছিল। ১৯১০ সালে অরবিন্দ যে পটভূমি তৈরি করেন তার ফলেই পরবর্তী কালে মহাত্মার পক্ষে বড় ধরণের আন্দোলন করা সম্ভব হয়। পরে তিনি বোমা-মামলায় আদালতে অভিযুক্ত হন। তরুণ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের সওয়ালে তছনছ হয়ে গেল পুলিশের সাজানো মামলা। গ্রেফতারের সময় তাঁর বাড়ি থেকে যেসব কাগজপত্র পাওয়া গিয়েছিল, কোর্টে জমা দিতে দেখা

গেল, সেগুলো স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে লেখা চিঠি, দেশ তাঁর কাছে কী তার ব্যাখ্যা। চিত্তরঞ্জন তীক্ষ্ণ যুক্তিজালে প্রমাণ করলেন, অরবিন্দ এক সর্বত্যাগী মহামানব। বিনা পারিশ্রমিকে তিনি মামলা লড়লেন। মামলার অন্যান্য খরচ চালাতে বিক্রি করলেন শখের ব্রুহাম গাড়ি ও ওয়েলার ঘোড়া এবং স্বয়ং ঝাঁপালেন স্বদেশি আন্দোলনে। অরবিন্দ মুক্তি পান ১৯০৮ সালের ৬ মে তারিখে। তাঁর স্মৃতিতে আলিপুর আদালতে একটি কক্ষে মিউজিয়াম স্থাপিত হয়, যা একটি দর্শনীয় স্থান। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১০ সালের মধ্য রাত্রে কলকাতা ত্যাগ করে তিনি পণ্ডিচেরির যোগাশ্রমের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তাঁর এই রাজনীতি থেকে যোগীরূপে রূপান্তরের জন্য তিনি সমালোচনারও সম্মুখীন হন, তা সত্ত্বেও তাঁর রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞ যে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

পণ্ডিচেরির যোগাশ্রম—

১৯১৪ সালে স্বামী পল রিশারের সঙ্গে শ্রীমা (পূর্ব নাম সিমেম মীরা রিশার) ওখানে আসেন। এই সময় পলের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে "আর্য" পত্রিকা প্রকাশের সূচনা হয়। পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ ১৪ আগস্ট ১৯১৪ এবং শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে। "আর্য" পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের যেসব লেখা প্রকাশিত হয় তার মধ্যে কয়েকটি লেখা, যথা— "The Life Divine", "The Synthesis of Joga", "The Secret of Veda", "Isha Upanishad", The psychology of of Social Development", The Future Poetry", "The Renaissance in India", "A Defence of Indian Culture" ইত্যাদি।

বিপ্লবী অরবিন্দ সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি জ্ঞাত, কিন্তু তাঁর সাহিত্য চর্চা ও তাঁর অবদান বিষয়ে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। আর আমরা হয়তো অনেকেই জানি না যে, **সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম একাধিকবার প্রস্তাবিত হয়েছিল**। বহু দেশি ও বিদেশি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিভিন্ন সময়ে তাঁর সাহিত্যকীর্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে বার্টন্ড ব্যাসেল, রোঁমারোঁলা পর্যন্ত অনেক খ্যাতিমান লেখকই তাঁর লেখার প্রশংসা করেছেন।

খুব ছোট বয়স থেকেই তিনি ইংরাজিতে কবিতা লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম কবিতার বই বের হয় ১৮৯৫ সালে। নাম— 'Song of myrtilld"। এর ২য় সংস্করণও প্রকাশিত হয়। রসিক সমাজে বইটি সমাদৃত হয়। দাদামশাই রাজানারায়ণ বসুর মৃত্যুতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন— "Transiet Non Permit" নামে ইংরেজি কবিতার মাধ্যমে। এ ছাড়া কালিদাসের—"বিক্রম-উর্বশী" অবলম্বনে রচনা করেন— "The Hes and the Nymph", অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখেন— "Persins the Nymph", অরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করেন। কবিতা দুটির নাম— "Saraswati with Lotus, The Sweet Voice ever spoke in prose. তিনি তাঁর "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতটি অনুবাদ করে তার অন্তর্নিহিত বাণীটিকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। এখানে তার অংশ বিশেষ উদ্ধৃতি দিয়ে গেল— "BANDE MATRAM— I Bow to thee Mother/Richly watered, richly fruted,/cold with winds of south./Dark with the crops of the harvests/The Mother...

এদেশে অরবিন্দের লেখা প্রথম প্রকাশিত হয় মুম্বাইয়ের "ইন্দু প্রকাশ" পত্রিকায়। পরবর্তীকালে— "বন্দেমাতরম্", "যুগান্তর", "কর্মযোগিনী", ধর্ম, "Modern Review", "Mother India", "Bulletin প্রভৃতি পত্রিকায়। তাঁর দার্শনিক লেখাগুলি মূলত "আর্য" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

অরবিন্দ রাজনীতি, দর্শন, কাব্য, সাহিত্য, নাটক, ইতিহাস প্রভৃতি বহু বিষয় নিয়ে লিখেছেন, এমন কি অনুবাদ করেছেন বহু, যখন যা ভাল লেগেছে। যথা— দেশবন্ধুর "সাগর সঙ্গীত", "বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ", "বিদ্যাপতি" ও চণ্ডীদাসের বহু রচনা, বিখ্যাত সঙ্গীতকার নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত), কবিয়াল হরু ঠাকুরের গান, এমনকি সেই তালিকায় রয়েছেন— কবি নিশিকান্ত, হারিন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সরোজিনী নাইডু, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখও।

সংক্ষেপে শ্রী অরবিন্দের "নোবেল" পুরস্কার প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি প্রসঙ্গ ঃ

মহাভারতের সাবিত্রী ও সত্যবান কাহিনী অবলম্বনে তিনি এক অমর মহাকাব্য সৃষ্টি করেন। "Tale and Avesion" (১৯১৬), অনেকের কাছে তা বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে অতুলনীয় বলে মনে হয়েছে। এ ছাড়া আছে তাঁর লেখা অসংখ্য চিঠি— যা এক অনন্য সৃষ্টি "পত্র-সাহিত্যের"। তিনি লিখেছেন প্রায় সবই ইংরেজি ভাষায়। সে ভাষার বাঁধুনি নৈপুণ্য যেমন উৎকৃষ্ট তেমনি বিশ্বজনিত। আর সম্ভবত সেই কারণে ১৯৪৪ সালে ফ্রন্সিস ইয়ং হাজবা তাঁর নাম নোবেল পুরস্কারের জন্য প্রস্তাব করেন। সেই বছর তিনি পুরস্কার পেলেন না। তবে পুরস্কার না পেলেও তাঁর সাহিত্যকীর্তি নিয়ে সমগ্র বিশ্বে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং এ বিষয়ে আরও বেশি চর্চা শুরু হয়। এর কয়েক বছর পর ১৯৫০ সালে আবার "নোবেল" পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম প্রস্তাবিত হয়। এবার প্রস্তাব করেন চিলির "নোবেল" জয়ী সাহিত্যিক গ্যাব্রিয়েল মিস্ত্রাল (১৯৪৫)। তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করেন আর এক "নোবেল" জয়ী সাহিত্যিক আমেরিকার পার্লবাক (১৯৩৮) ও আরও অনেকে।

এবার কিন্তু "নোবেল" পুরস্কারের জন্য প্রস্তাবিত নাম শুধু বিদেশে নয় দেশের শিক্ষিত গুণীজনের মধ্যেও কৌতুহল-উদ্দীপনা জাগায়। তাঁরা সম্মিলিতভাবে অরবিন্দকে এই পুরস্কারের জন্য সমর্থন করেন ও সুডিস একাডেমির কাছে প্রস্তাব প্রেরণ করেন। এতে স্বাক্ষর করেন— কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিভিন্ন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল, গোয়ালিওর ওরেওয়ার মহারাজা, পি.টি.আই-এর জেনারেল ম্যানেজার, অমৃতবাজার পত্রিকার তুষার কান্তি ঘোষ, জেমস কাজিনস, ডা. ডি. এন. ওয়াদিয়া, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, কে. সি নিয়োগী, গোপাল স্বামী আয়েঙ্গার, এন. ডি. গ্যাডগিল, জয়রাম দৌলতরাম ও আরও অনেকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভাবতে অবাক লাগে, যখন দেখা যায় স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে এখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম নেই— কারণ অজ্ঞাত।

দেখা যায় ১৯৫০ সালেও তিনি পুরস্কার পেলেন না। এর পর ৫ ডিসেম্বর ১৯৫০ তো তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। এই সঙ্গে তাঁর "নোবেল" জয়ের সম্ভাবনাও ইতি ঘটে।

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের কথায় ফিরি— "সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো/সেই তো তোমার ভালো/অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো।"

ঋণ স্বীকার

১। কৃত্তিকা পত্রিকা; ২০১০ বইমেলা সংখ্যা

২। Society Regligion & Culture of Bengal – Sudhir Kumar Mitra

৩। পুরশ্রী ও অন্যান্য।

দুখী ঈশ্বর

গৌতম রায় চৌধুরী

এই দুখী ঈশ্বর নিরাকার-ভগবান নন। ইনি ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অনেক উপাধি— বিদ্যাসাগর, করুণাসাগর, দয়ার সাগর। উনবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি তথা ভারতীয়। তবু দুঃখী? এক অন্য বিষাদসিন্ধু, অনন্ত দুঃখের কাহিনি। পারিবারিক বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা— মা, বাবা, ভাই, পুত্র, জামাতা সকলের সঙ্গে সম্পর্কে ভাঙন; সমসাময়িক রক্ষণশীল সমাজের কুৎসা ও প্রবঞ্চনা তাঁকে দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত করেছিল।

সেই সময়ের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বিদ্যাসাগর, ঠাকুরদাসের জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে মাত্র ২২ বছর বয়েসে এক বৃহৎ পরিবারের আর্থিক দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তখন প্রথম চাকরিতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদার হিসাবে বেতন পেতেন ৫০ টাকা। বৌবাজারে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন, সঙ্গে দুই ভাই দীনবন্ধু ও শম্ভুচন্দ্র ছাড়াও ৪ জন পিসতুতো ভাই ও অন্যান্য আত্মীয় মিলে মোট ১০ জন। মাইনের ২০ টাকা ঠাকুরদাসকে পাঠিয়ে বাকি টাকায় কলকাতার খরচ চালাতেন। পরবর্তীকালে দীনবন্ধু রোজগার শুরু করলে বিদ্যাসাগরের চাপ কিছুটা কমলেও, বীরসিংহ গ্রাম ও কলকাতার দুই বৃহৎ পরিবারের আর্থিক দায়টা মূলত বিদ্যাসাগরেরই ছিল। ১৮৩৫ সালে মাত্র সাড়ে চৌদ্দ বছরে আট বছরের বালিকা দিনময়ীর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিয়ে হয়। বাড়ির মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে ঠাকুরদাসের কোনো উৎসাহ ছিল না। তাঁর পুত্রবধূরা সকলেই ছিলেন নিরক্ষর। পিতৃভক্ত বিদ্যাসাগরও ঠাকুরদাসের ইচ্ছাতেই সম্মতি দিয়েছিলেন। অবশ্য তিনি নিজের মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে কোনো অবহেলা করেন নি। শিক্ষার অভাবে এবং সংস্কৃতির ফারাকের জন্য বিদ্যাসাগর ও দিনময়ীর দাম্পত্য সম্পর্ক কখনোই দৃঢ় হয় নি। উপরন্তু প্রায় ২২ বছর বয়স অবধি সন্তানের জন্ম দিতে না পারার অক্ষমতার লজ্জায় এবং পরিজনদের গঞ্জনার ফলে দিনময়ী নিজেকে আরও গুটিয়ে নিয়েছিলেন। ১৮৪৯ সালে প্রথম পুত্র সন্তান নারায়ণ ও পরে আরও চারটি কন্যা সন্তানের জন্ম হলেও যৌবনে বিদ্যাসাগর পারিবারিক জীবনযাপনের কদাচিৎ সুযোগ পেয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর রীতি অনুযায়ী তিনি থাকতেন কলকাতায় এবং ঠাকুরদাস বীরসিংহ গ্রামে বৃহৎ পরিবার দেখাশুনা করতেন। ১৮৫০ থেকে ১৮৫৮ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের জীবনের সবচেয়ে কর্মবহুল সময়। রাতের পর রাত লাইব্রেরিতে রাত কাটিয়েছেন। রাতে খাচ্ছেন কখনও বন্ধু শ্যামাচরন বিশ্বাসের বাড়ি কখনও লাইব্রেরিতেই। এই সময় স্ত্রীর সান্নিধ্য ও পরিচর্যা, সন্তানের স্নেহ-ভালোবাসা তিনি পান নি। পারিবারিক বিশ্বাস ও শান্তির পরিমণ্ডল যে শক্তি তা বিদ্যাসাগরের অধরা ছিল। সেই কর্মব্যস্ত জীবনে তিনি ছিলেন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। পাঁচটি সন্তানের জনক হয়েও অবস্থার ফেরে তিনি সন্তান স্নেহে বঞ্চিত ছিলেন। এই অতৃপ্ত সন্তান-স্নেহের ফল্গুধারা প্রকাশ পেয়েছে "প্রভাবতী সম্ভাষণ" নামক একটি রচনায়। ১৮৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে উত্তরপাড়ায় ঘোড়ার গাড়ির দূর্ঘটনার পর বিদ্যাসাগর রাজকৃষ্ণের সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী ছিলেন। সকলের শুশ্রূষাতেই তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। রাজকৃষ্ণের কন্যা প্রভাবতী তাঁর স্নেহের পাত্রী হয়ে ওঠে। মাত্র তিন বছর বয়সে কলেরায়

প্রভাবতীর মৃত্যু তিনি মেনে নিতে পারেন নি। বিদ্যাসাগরের অবরুদ্ধ পিতৃস্নেহ উচ্ছ্বসিত হয়ে 'প্রভাবতী
সম্ভাষণে'র মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল।

ঠাকুরদাস বীরসিংহ গ্রামে বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করলেও পরিবারের
সকলের প্রতি সমদর্শী ছিলেন না। বিদ্যাসাগরের জন্য গর্ব অনুভব করতেন, কিন্তু বেশি স্নেহ, সহানুভূতি বা
পক্ষপাতিত্ব ছিল বলে মনে হয় না। উপরন্তু, একটি স্বপ্নদর্শনের ফলে সংসার ত্যাগ করে কাশীবাসি হলেন।
জ্যোতিষী গণনা করে জানালেন যে বিদ্যাসাগরের ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, বন্ধুবিচ্ছেদ এমন কী দেশ ত্যাগ অবশ্যম্ভাবী।
বিদ্যাসাগরের আসন্ন বিপদের কথা শুনেও তাঁর কাশীবাসের সিদ্ধান্ত ছেলের প্রতি ঔদাসীন্যতারই পরিচয়
দেয়। ঠাকুরদাসের কাশীবাসের ফলে (১৮৬৫, ডিসেম্বর) বীরসিংহ গ্রামের বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে অশান্তি
বেড়ে গেল। আগে যা ছাইচাপা ছিল এখন তা প্রকাশ্যে চলে এল। ১৮৬৬ সালে ঘোড়ার গাড়ির দুর্ঘটনার
পর বিশ্রামের জন্য বিদ্যাসাগরকে বীরসিংহ গ্রামে কিছুদিন থাকতে হয়েছিল। এই সময় পারিবারিক কলহের
কুৎসিৎ রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করলেন। তাছাড়া বাড়ির বধূদের নিরক্ষরতা, ছোটভাই ঈশান, পুত্র নারায়ণ ও
অন্যান্য ভাইপোদের উচ্ছৃঙ্খলতা ইত্যাদি যে একান্নবর্তী পরিবারের বিষময় ফল তা তিনি উপলব্ধি করতে
পেরেছিলেন। তাই তিনি পৃথগন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। নিজ ব্যয়ে প্রত্যেক ভাই-বোনের পৃথক বাড়ি
তৈরি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন এবং প্রত্যেকের সংসার খরচের টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করলেন।
বীরসিংহের বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার ঠাকুরদাসের কাশীযাত্রার দুই বছরের মধ্যেই ভেঙ্গে গেল। মাতা ভগবতী
দেবী বাধা দিয়েছিলেন, পিতা ঠাকুরদাস উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। ভাই, বোনেরাও সবাই রেগে গিয়েছিলেন।
আত্মীয়স্বজনরাও কেউ সুখী হন নি। প্রকৃতপক্ষে, সেই আমলে একান্নবর্তী পরিবার জমির উপসত্ত্বভোগী
মধ্যবিত্তের সামাজিক আদর্শ ছিল। তাই আত্মীয়স্বজনদের বেশির ভাগই নিন্দা করতেন, এমনকী কুৎসা রটনাতেও
পিছপা হন নি। তৃতীয় কনিষ্ঠ শম্ভুচন্দ্র পুরোপুরি বিদ্যাসাগরের উপর নির্ভরশীল ছিলেন; মেজভাই দীনবন্ধু
বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরি পেলেও সে চাকুরি বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারেন নি
এবং পরবর্তীকালে গ্রামে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করলেও কোনো স্থায়ী আয় ছিল না; ছোটভাই ঈশানচন্দ্র
ব্যাবসার চেষ্টা করে ঋণগ্রস্থ হয়েছিলেন, যা বিদ্যাসাগরকেই শোধ করতে হয়। অর্থাৎ ভাইয়েরা প্রত্যেকেই
বিদ্যাসাগরের উপার্জনের উপর আর্থিক ভাবে নির্ভরশীল ছিলেন। স্বভাবতই হঠাৎ পৃথগন্ন হওয়ার ফলে
নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন। ফলে তাঁরা কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে বিরূপ হয়ে উঠলেন। ভাইদের মধ্যে
অসন্তোষের আগুন তুষানলের মত সর্বদাই জ্বলত। কিছুটা আভাস পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগরের পৈতৃক ভিটা
আগুনে ভস্মীভূত হওয়ার ঘটনায়। সবাইকে আলাদা বাড়ি করে দিলেও বিদ্যাসাগরের পরিবার, মা ভগবতীকে
নিয়ে পৈতৃক ভিটেতেই থাকতেন। বিদ্যাসাগরের অর্থে ঠাকুরদাসের পরিকল্পনায় ও তত্ত্বাবধানে এই মাটির
দোতলা বাড়িটি তৈরি হয়েছিল। ১৮৬৯ সালের মার্চ মাসে একরাতে এটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। আগুন
লাগার প্রকৃত কারণ জানা না গেলেও, পারিবারিক বিদ্বেষ যে এর পিছনে ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পারিবারিক বিদ্বেষের চরম রূপ দেখা গেল, তিন ভাইয়ের মুখপাত্র রূপে দীনবন্ধুর সংস্কৃত প্রেস ও
বইয়ের ব্যাবসার অংশ দাবি করার মধ্য দিয়ে। দীনবন্ধু দাবি করলেন যে ১৮৪৭ সালে প্রেস প্রতিষ্ঠার সময়
তিনি দুইশত টাকা ধার করে প্রেসে দিয়েছিলেন। তাছাড়া পারিবারিক ব্যাবসা হিসাবে এতে তাঁরও অংশ

আছে। অবশ্য মামলা হয় নি, দ্বারকানাথ মিত্র ও দুর্গামোহন দাসের মধ্যস্থতায় এই বিবাদের মীমাংসা হয়। দীনবন্ধু জানালেন,—

> "সামান্য বিষয়ের নিমিত্ত সহোদরে সহোদরে বিবাদ করা নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ কাজ বিবেচনা করিয়া লিখিয়া দিতেছি যে সংস্কৃত যন্ত্র ও তৎ সংক্রান্ত পুস্তকালয় আমার স্বত্ব ও অংশ থাকার যে দাবী করিয়াছিলাম সে দাবী পরিত্যাগ করিলাম।"

চণ্ডীচরণ, পৃষ্ঠা ৩২৭

দীনবন্ধুর ওই দাবির পিছনে একটা কারণ অনুমান করা যায়। বিদ্যাসাগরের দান, প্রকৃতপক্ষে সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার প্রবণতা এবং ব্যাবসার বিষয়ে কিঞ্চিৎ খামখেয়ালীপনা, তাঁর উপর নির্ভরশীল ভাইদের মনে আর্থিক অনিশ্চয়তা থেকে তীব্র ভয়ের সঞ্চার করেছিল। কর্মচারীদের কাজকর্মে বিরক্ত হয়ে বিদ্যাসাগর বিনামূল্যে বন্ধু ব্রজনাথকে বইয়ের ব্যাবসা দান (ডিপজিটরী) করে দেন। তখন দীনবন্ধু সরাসরি বিদ্যাসাগরকে প্রশ্ন করেন যে যেখানে বিধবা বিবাহের জন্য বিদ্যাসাগরের পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি ঋণ আছে তখন এই ব্যাবসা ব্রজনাথবাবুকে বিনা পয়সায় কেন দেওয়া হল। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে উদার প্রকৃতির বিদ্যাসাগর সমস্ত বিষয়ই নষ্ট করে ফেলবেন। এই আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না তা বোঝা গেল যখন বিধবা বিবাহের জন্য বিদ্যাসাগরের ঋণ পরিশোধে সংস্কৃত প্রেসের দুই-তৃতীয়াংশ বিক্রি করে দিতে হল। দীনবন্ধুর দাবির পিছনে যে কারণই থাক না কেন, এটা বিদ্যাসাগরের মনে রেখে গেল এক দীর্ঘস্থায়ী তিক্ত স্মৃতি। পরিবারের বেশির ভাগ সদস্যই তাঁকে নিজ স্বার্থসিদ্ধির সোপান হিসাবে ব্যবহার করেছেন, প্রকৃত ভালোবাসেন নি। তাই পারিবারিক জীবনে শান্তি তাঁর অধরাই ছিল।

ভ্রাতৃবিরোধের চরম পরিণতি হল আবাল্য পরিচিত, প্রাণাধিক প্রিয় বীরসিংহ গ্রাম ত্যাগ। ১৮৬৯ সালে ক্ষীরপাইনিবাসী ক্ষুদিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোমোহিনী নামক এক বিধবার বিবাহে বিদ্যাসাগর প্রথমে সম্মতি জানালেও, পরবর্তীকালে ক্ষীরপাই গ্রামের ভূস্বামী, হালদারদের অনুরোধে ওই বিবাহে আপত্তি জানান। ঘটনার বিবরণ শম্ভুচন্দ্রের জবানীতে শুনুন ঃ—

> "অগ্রজ মহাশয়ের অসন্তোষের ভয়ে আমি আর ঐ বিষয়ে লিপ্ত রহিলাম না এবং ঐ বিবাহে যাই নাই। ..... ঈশান ও গোপাল (সহোদর দীনবন্ধুর ছেলে) চাঁদা করিয়া বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিয়া, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন প্রভৃতিকে ও গ্রামবাসীদিগকে এবং স্কুলের শিক্ষকদিগকে সন্ধ্যার সময় বিবাহের নিমন্ত্রণ করেন। .....
>
> পরদিন প্রাতঃকালে ঈশানচন্দ্র দাদার নিকট উপস্থিত হইলে দাদা বললেন, ঈশান তুমি কেন বিবাহ দেওয়াইলে, ইহাতে আমার বড় অসম্মান হইয়াছে। ঈশান উত্তর করিল, কৈলাস মিশ্র ও আমি গত পরশু আপনাকে যখন জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এই বিধবা বিবাহ ন্যায্য কি না? তাহাতে আপনি উত্তর করিলেন, ইহা শাস্ত্রসম্মত ও ন্যায়ানুগত বলিয়া আমি স্বীকার করি, কিন্তু হালদারবাবুদের মনে দুঃখ হইবে। ঈশানচন্দ্র উত্তর করিলেন, লোকের খাতিরে এই সকল বিষয়ে পরাঙ্মুখ হওয়া ভবাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে দুষনীয়। শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্রোধভরে বলিলেন, 'তুই কি এখনও সেইরূপ দুর্মুখ আছিস এবং এইরূপই চিরকাল থাকবি?" আরও এইরূপ দুই-চারি কথার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "আমি আর দেশে আসিব না।"

শম্ভুচন্দ্র, পৃষ্ঠা ১৭২

যদিও চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিবাহের উদ্যোক্তা হিসাবে শম্ভুচন্দ্রকেই চিহ্নিত করেছেন।

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনভিমতে ও অজ্ঞাতসারে তাঁহার বাটীর সম্মুখস্থ বাটীতে ক্ষুদিরামের বিবাহ দিবার সাহস বিদ্যারত্ন ভিন্ন অন্য কাহারও সম্ভবপর ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এতদূর অগ্রসর হইতে সাহসী হওয়া যেমন তেমন লোকের পক্ষে সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আর অগ্রজানুগত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহায়তা না থাকিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনভিপ্রেত কার্য্য বীরসিংহ গ্রামে সহজে সম্পন্ন হইতে পারিত না। আমরা বীরসিংহ হইতে সংবাদ আনিয়াছি, তাহাতে প্রকাশ যে :— শম্ভুচন্দ্রই উদ্যোগী হইয়া বিবাহ দিয়াছিলেন।"

চণ্ডীচরণ, পৃষ্ঠা ২৯১

তিন সহোদরই এই বিবাহে জড়িত ছিলেন এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। অবশ্য বিদ্যাসাগরের গ্রামত্যাগের কারণ কেবল হালদারবাবুদের নিকট কথার খেলাপের জন্য ক্ষোভ ও অভিমানের ফলশ্রুতি নয়। বিধবাবিবাহ প্রবর্তনকারীর বিধবাবিবাহে বাধাদান, চরম স্ববিরোধিতা। হয়তো তিনি জমিদারদের (যাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অত্যাচারে ওই অঞ্চলে বিধবা বিবাহ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসছিল) সঙ্গে পারস্পরিক বোঝাপড়ায় আসতে চেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের অস্বস্তি অনুমান করতে অসুবিধা হয় না।

যাই হোক না কেন, সহোদরসহ আত্মীয়স্বজনদের এই আচরণ তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তাই শুধু গ্রাম নয়, সংসারে থেকেই নিজেকে নির্বাসিত করতে চেয়েছিলেন। ১৮৬৯ সালের নভেম্বর মাসে পিতা-মাতাসহ পরিবারের সকল সদস্যদের চিঠি লিখে সংসার থেকে বিদায় নিয়ে নিভৃতবাসের বাসনা প্রকাশ করেন। কিন্তু সকলের মাসোহারা প্রদানে তিনি অঙ্গীকার করেন।

"এই সকল দ্বারা বেশ স্পষ্টরূপেই বোঝা যাইতেছে যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রী পুত্র সহোদরগনের দ্বারা সংসার জীবনে সুখী হইতে পারেন নাই। কেবল সুখী হইতে পারেন নাই তাহা নহে, অনেক স্থলে নিতান্ত অসুখী হইয়া মনের ক্লেশে দিন যাপন করিয়াছেন, কিন্তু এই সকল অস্বস্তিকর ব্যাপারের মধ্যেও কখনও কাহারও সুখ সাধনে বিমুখ ছিলেন না।"

চণ্ডীচরণ, পৃ. ২৯৯

বিদ্যাসাগরের পারিবারিক জীবনের সম্ভবত সবচেয়ে বড় দুঃখ ছিল পুত্র নারায়ণ। ২৯ বছর বয়সে ১৮৪৯ সালে নারায়ণের জন্ম। ছোট ভাই ঈশান ও পুত্র নারায়ণকে শিক্ষার জন্য কলকাতায় আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঠাকুরদাসের আপত্তিতে সে চেষ্টা সফল হয় নি। নারায়ণের জন্মের দু'বছরের মধ্যে ঠাকুরদাস তার দুই পুত্র হরচন্দ্র এবং হরিশ্চন্দ্রকে হারিয়ে (কলেরা রোগে), মানসিকভাবে খুব ভেঙ্গে পড়েন এবং ঈশান ও নারায়ণকে আঁকড়ে ধরেন। পিতৃভক্ত বিদ্যাসাগরও জোর খাটান নি। ষোল বছর বয়েসে কলকাতায় এনে ভর্তি করলেও, কোনো বিশেষ কারণে নারায়ণ দেশে ফিরে যান। ঠাকুরদার অতিরিক্ত প্রশ্রয়ে নারায়ণের চরিত্র গড়ে ওঠে নি।

"ঐ বৎসর (১৮৫১) আশ্বিন মাসে অগ্রজ মহাশয় বাটীতে আসিয়া দেখিলেন, কনিষ্ঠ সহোদর ঈশান ও তাঁহার পুত্র নারায়ণকে পিতৃদেব অত্যন্ত আদর করেন; তদ্দর্শনে পরিহাসপূর্বক পিতৃদেবকে বলিলেন, 'আপনি ঈশানের ও নারায়ণের মাথা খাইতেছেন, তথাপি আপনি লোকের নিকট আপনাকে কিরূপে নিরামিষাশী বলিয়া পরিচয় দেন?"

শম্ভুচন্দ্র, পৃ. ৪৯

প্রথম জীবনে নারায়ণের সঙ্গী ছিলেন তার কাকা দুর্মুখ ঈশান এবং খুড়তুতো ভাই গোপাল, যে ছিল মুখ ও পানাসক্ত। এদের প্রভাব নারায়ণের উপর পড়েছিল বলেই মনে হয়।

১৮৬৯ সালে বিদ্যাসাগর যখন সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বাবা, মা, সহোদর এমনকী স্ত্রী দিনময়ীকেও চিঠি দিয়ে সংসার বৈরাগ্যের কথা জানাচ্ছেন, তখনও পুত্র নারায়ণকে কোনো চিঠি দেন নি। উপরন্তু স্ত্রীকে লিখলেন,— '*তোমার পুত্র উপযুক্ত হইয়াছেন অতঃপর তিনি তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।*' নারায়ণের প্রতি তাঁর ক্ষোভ স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। কিন্তু ১৮৭০ সালে নারায়ণের বিধবা বিবাহের খবরে এতই আনন্দিত হয়েছিলেন যে, শম্ভুচন্দ্রকে চিঠি দিয়ে জানান, যে নারায়ণ তাঁহার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। পরিবারের অধিকাংশের বিরুদ্ধাচারণ করেও তিনি ওই বিবাহে পুত্রের পাশে ছিলেন।

বিবাহের দুই বছরের মধ্যে পুত্রের প্রতি পিতার বিশ্বাস ভেঙ্গে গেল। ১৮৭২ সালে নারায়ণের সঙ্গে তাঁর সবরকম সম্পর্কের অবসান ঘটে। ১৮৭৪ সালে বিদ্যাসাগরের নির্দেশে তাঁর বাড়িতে নারায়ণের প্রবেশ বন্ধ হয়ে গেল। সর্বোপরি, ১৮৭৫ সালের ৩১ মে তিনি যে উইল করেছিলেন তার ২৫ তম ধারায় লিখলেন—

> "আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী এজন্য ও অন্য অন্য গুরুতর কারণবশতঃ আমি তাহার সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছি।"
>
> অমিয় কুমার সামন্ত, পৃ. ৩৮০

উইলটি তিনি তাঁর জীবদ্দশায় পরিবর্তন করেন নি। দুই-তিন বছরের মধ্যে পুত্র সম্পর্কে বিশাল মত পরিবর্তনের কারণগুলি জানা যায় নি। চারটি জীবনীগ্রন্থ বিদ্যাসাগর-জীবন চর্চার আকর গ্রন্থ বলে স্বীকৃত, অর্থাৎ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের (১৮৯১ সালে মৃত্যুর দুই মাসের মধ্যে প্রকাশিত) 'বিদ্যাসাগর জীবন চরিত'; চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' (১৮৯৫); বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর' (১৮৯৫, চণ্ডীচরণের কয়েক মাস পর) এবং সুবল চন্দ্র মিত্রের প্রথম ইংরেজি জীবনী 'দি লাইফ অফ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর'। বিদ্যাসাগর কী কারণে নারায়ণের উপর রুষ্ট হয়েছিলেন, চারজনের কেউই স্পষ্ট কোনো উত্তর দেন নি।

> একমাত্র পুত্র নারায়ণ নিজদোষে দীর্ঘকাল পিতার স্নেহ ও মমতায় বঞ্চিত ছিলেন। পিতাপুত্রের এই দীর্ঘকালব্যাপী বিচ্ছেদের মধ্যে পুত্র অনেক সময় পিতার প্রিয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কোনও চেষ্টাই স্থায়ী ফলের প্রসূতি হয় নাই।"
>
> চণ্ডীচরণ, পৃ. ৪১২

> "বর্জিত পুত্র নারায়ণের জন্য পতির সহিত তাঁহার অনেক সময় বাদবিসংবাদ ঘটিত। এই বাদবিসংবাদই সদ্ভাবক্রটির মূল কারণ হইয়াছিল। অনেক সময় তিনি গোপনে পুত্রকে অর্থ সাহায্য করিতেন। এমন কি নিজের অলঙ্কার পর্যন্ত বন্ধক দিতেন। এজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে টাকাকড়ি দেওয়া বন্ধ করিতেন। .....দীনময়ীও তেমনি তেজস্বী ছিলেন। স্বামীর নিকট একবার কোন জিনিস চাহিয়া না পাইলে, তিনি দুর্জয় অভিমানে অভিভূত হইতেন। তেজস্বী বিদ্যাসাগর তাহার জন্য বিচলিত হইতেন না। এইরূপে মনোবাদ ঘটিত।
>
> বিহারীলাল, পৃ. ৩৬০

প্রথম জীবনীলেখক, সহোদর শম্ভুচন্দ্র, হয়তো পারিবারিক কেচ্ছা প্রকাশ হইবার ভয়ে, পিতা-পুত্র বিবাদের উল্লেখই করেন নি। সুবল মিত্রও বিশেষ কিছু বলেন নি।

নারায়ণকে 'যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী' বলার প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটন করা না গেলেও, পিতার মৃত্যুর পর তাঁর উইলকে কার্যকরী করার জন্য নারায়ণের কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই বিদ্যাসাগরের মূল্যায়নের সত্যতা প্রমাণিত হয়। বিদ্যাসাগরের উইল এক আশ্চর্য দলিল। অত্যন্ত সুসংবদ্ধ, আবেগ বা ক্রোধের কোনো প্রকাশ নেই। সকল আত্মীয়, বহু দূর-সম্পর্কের-আত্মীয় এবং বিভিন্ন সেবামূলক কাজের জন্য মাসিক অনুদানের ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু মন্দির বা ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো অর্থ বরাদ্দ করেন নি। নারায়ণ মামলা করে, ছলে-বলে কৌশলে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয়ে উইলে উল্লেখিত বৃত্তিগুলো বন্ধ করে দিলেন বা কমিয়ে দিলেন, মাসিক ১০০ টাকা বৃত্তি বন্ধ করার জন্য বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত 'ভগবতী বিদ্যালয়ের' নাম পরিবর্তন করে দিলেন, সর্বোপরি ঋণশোধের অজুহাত দেখিয়ে পাঠাগারসহ বহু সম্পত্তি বিক্রি করে দিলেন, যদিও মৃত্যুর সময় বিদ্যাসাগরের কোনো দেনা ছিল না। বাদুড়বাগানের বাড়িতে বাস করার অনুমতি পেয়ে, সেটাকে "বিদ্যাসাগর মন্দির" হিসাবে উল্লেখ করে নিজেকে "সেবাইত" বলে ঘোষণা করলেন। অথচ, বিদ্যাসাগর জীবনে কোনো মন্দিরে যান নি এবং তথাকথিত দেব-দেবীতে বিশ্বাস করতেন না। আইনে যাই হোক না কেন, বিদ্যাসাগরের উইলের তথা ধনসম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারী নারায়ণ নয়। নারায়ণের অর্থলোভ, অনৈতিকতা, চারিত্রিক স্খলন এবং বিদ্যাসাগরের আদর্শের প্রতি উদাসীনতাই ছিল বিদ্যাসাগরের চরম দুঃখের কারণ।

বিপথগামী পুত্রের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে অসহায় পিতার আত্মসমর্পণ, মহাভারতের যুগ থেকে হালফিলেও বিদ্যমান। ধৃতরাষ্ট্রের মতই আজকের অনেক পিতাই 'দুর্যোধনের' শত অপরাধে দুঃখ পেলেও 'অতি বিষম বস্তু' স্নেহের তাড়নায় তা মেনে নিয়েছেন। প্রকাশ্য দরবারে 'দ্রৌপদী'র লাঞ্ছনা অসহায় ভাবে সহ্য করেন। আমরা অনেক সৎ, প্রগতিশীল দৃষ্টিসম্পন্ন অসাধারণ মানুষকে দেখেছি যারা নিজের সন্তানের প্রতি দুর্বলতা কাটিয়ে মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারেন নি। কিন্তু, দুশো বছরের পূর্বে জন্ম নিয়েও, বিদ্যাসাগর ছিলেন 'বজ্রাদপি কঠোরানি'। সন্তানসহ প্রিয়জনদের প্রতি বিন্দুমাত্র দুর্বল না হয়ে, অনায়াসে যুক্তিনিষ্ঠ কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই, 'দুখী' হলেও, তিনি এক প্রকৃত প্রগতিশীল পথ প্রদর্শক।

এও বাহ্য, কুৎসা তাঁর জীবনে যে দুঃখ ডেকে এনেছিল তা আমরা পরে আলোচনা করব।

তথ্যঋণ ঃ—

১) শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরস, চিরায়ত, ২০১৯
২) চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, প্রকৃতি, ২০২০
৩) বিহারীলাল সরকার, বিদ্যাসাগর, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৮৬
৪) অমিয় কুমার সামন্ত, বিদ্যাসাগর, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১২
৫) শঙ্খদীপ ভট্টাচার্য, পিতা-পুত্র বিসংবাদ, সংবর্তক পত্রিকা, জানুয়ারি, ২০২০

কেরানির আকাশ

মৃণাল দত্ত

জ্ঞানস্যার চাকুরি জীবন থেকে অবসর নিলেন। স্নাতক জীবনের পাঠক্রম শেষে স্থানীয় বাংলা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছিলেন। সেই সুবদে পাড়ার সকলের কাছে তিনি 'স্যার' হিসেবে পরিচিতি পান। পরে সরকারি দপ্তরে অধঃস্তন কেরানির চাকুরি পেয়ে শিক্ষকতার জীবন পরিত্যাগ করেন। কিন্তু এলাকায় তিনি আজো 'জ্ঞান স্যার'-ই রয়ে গেলেন। এতদিন তার ছাত্ররা পিতা হয়েছে, অনেকে নাতি-নাতনীর মুখও দেখে ফেলেছে। জ্ঞানবাবুর পরিচিতি আজো 'স্যার'। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সময় ছাত্রদের বঙ্গভাষা মাতৃদুগ্ধ বিষয়ে পাঠ দিয়েছেন কিন্তু কাউকেই 'স্যারে'র বদলে শিক্ষক মশাই বলাতে পারেননি।

এবার জীবনের অন্য স্বাদ— অবসর জীবন তাকে নানা রকমের ভাবনায় আনন্দ দেয়। শৈশবের কথা, কিশোর বেলার কথা, শিক্ষক জীবনের কথা প্রায়ই তাকে তৃপ্তি দেয়। এখন তিনি বাড়ি বানাচ্ছেন। অবসর জীবনে পি. এফের টাকা, ভাতা ইত্যাদি মিলিয়ে যা পেয়েছেন তা দিয়ে পুরনো টালির চালের মাটির ঘরখানি ইটের দু-কামরা করছেন। নিজেই দেখাশোনা করছেন, মিস্ত্রি-মজুর খাটাচ্ছেন।

স্ত্রী মাধবীলতা, দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে এই মাগ্গিগন্ডার বাজারে অভাব-অনটনে পাকা বাড়ি বানাতে পারেন নি। ছেলে-মেয়ে বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। বেতন লাগে না। যে কারণে পুত্র-কন্যার পড়ানোর খরচ কম। তদুপরি, ছেলে মেয়ে পড়াশোনায় ভালো, কিঞ্চিৎ মেধাবীও বলা যায়।

স্ত্রী সুগৃহিনী। রান্নাঘরের পাশে ফাঁকা মাটিতে লংকা চারা, পুঁই মাচা, উচ্ছে লতা ইত্যাদি গাছ-গাছালি নিয়ে তার ভরা সংসার।

আজ জ্ঞান স্যারের মাথায় কিছু ভাবনা চাগিয়ে উঠেছে। খবরের কাগজে তিনি প্রবীণ দিবসের বার্তা পেয়েছেন। তা দেখেই তার মাথায় নতুন ভাবনার জন্ম। আচ্ছা, জগতে কত কত দিবসের সাড়ম্বর উদ্যাপন— মাতৃ দিবস, পিতৃ দিবস, ভাষা দিবস, বিজ্ঞান দিবস, কৃষক দিবস, নারী দিবস, প্রেম দিবস— আরো কত কত দিবস সারা বছর পালিত হয়— অথচ চাকুরিয়াদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ কেরানিদের নিয়ে কোনো দিবস নেই। তারাও তো মানুষ। অবশ্য যদি মানুষ বলা যায়— সংসারে পিষ্ট, চাকুরি জীবনে দপ্তরে দপ্তরে অবহেলিত কেরানিকুলই তো সরকারি প্রশাসনের অস্থি-মজ্জা-রক্ত-মাংস। কেরানিদের দিয়েই প্রতিদিনকার কর্মব্যস্ত অফিসের শুরু, দিনান্তে ডেসপ্যাচের পর দিনের কাজ শেষ। এই যে এত এত কেরানি মানুষ যারা দপ্তরে কম বেতন পান, যাদের জীবনে অভাব অনটন নিত্যসঙ্গি তাদেরকে সমাজ কেন মান্যতা দেবে না! বাণিজ্য সফল চলচ্চিত্রে কেরানি জীবনের বেদনাঘন উপস্থাপনা ছাড়া কিইবা প্রাপ্তি তাদের!

শিক্ষকতা জীবন শেষে তিনি সরকারি দপ্তরে স্থায়ী চাকুরি নিয়েছেন, চাকুরি শেষে অবসরও নিলেন। এই কি মনুষ্য জীবনের সার্থকতা! দশটা-ছয়টার চাকুরির শুরু ভোরে— চা খেয়েই বাজার করা, মাথায় তেল

দিয়ে ঝপাঝপ স্নান শেষে নাকে মুখে ডাল ভাত খেয়ে, বৌয়ের রুটি আলুর তরকারী অযত্নে বানানো— তা ব্যাগে পুরে দে ছুট—দে ছুট, ট্রেন ধরা, হাঁটা পথে অফিস পৌঁছনো। হাঁটতে হাঁটতে চোখের সামনে হাজিরাখাতার লাল দাগের ভ্রূকুটি দেখেন। হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর দেবার আগেই হাঁক ডাক— এটা দাও, ওটা কোথায়, এটা কেন আগে পাঠানো হয়নি ইত্যাদি ইত্যাদি নিত্যকার অভিযোগ তৎপরতার সঙ্গে হাসিমুখে সামলাতে হয়। দেরী হলেই ওপর তলার বকুনি।

এই ঝক্কি সামলাতে সামলাতে জীবনের ৩৩-টি বছর পার করে আজ স্বস্থির অবসর জীবন। স্বস্থি না আরো নতুন চিন্তা। এই যে বাড়ি বানাচ্ছেন সে না হয় শেষ করা যাবে— ছোট হলেও নিজস্ব পাকা বাড়ি বড় আনন্দের, বড় স্বস্থির। কিন্তু চিন্তা যায় কৈ? মেয়েটি বড়— এ বছর মাধ্যমিক দেবে— তারপর উচ্চ মাধ্যমিক পার করে স্নাতক হওয়া। সে-ও তো বেশ কয়েক বছর। ছেলেটি নাইনে। ওর মাথা বেশ ভালো। ক্লাসে প্রথম হয় বিদ্যালয়ের গন্ডি পার হলে তাকে ডাক্তারী পড়াবার ইচ্ছে আছে। পারবেন কি তাকে পড়ানোর টাকা দিতে? মেয়েটির বিয়েও দিতে হবে। গিন্নি প্রায়ই সাবধান বাণী দেন 'দ্যাইখো বাপু, মাইয়ার বিয়ার টাকা জমাইয়া রাইখো।' এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, বিয়েটা যদি আরো আগে করতে পারতেন! কত চিন্তা কত চিন্তা— অবিরাম চিন্তা স্রোতে স্বস্থি মেলে এই নানাবিধ ভাবনায়। সারা জীবন বাঁধা গন্ডির। কিছুই তো পেলেন না সমাজের কাছ থেকে। এ পাড়ার প্রবীণ মানুষ তিনি।— ক্লাবে, পাড়ায় পূজার চাঁদা দেন নিয়মিত অথচ কোনদিন সভাপতি করেনি তাকে। যে অধ্যাপক ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকেন; নতুন এসেছেন। তিনি মাতৃভাষা দিবসে ভালো বক্তৃতা দেন। আবেগ দিয়ে বলেন, আমাদের পুত্র-কন্যাদের মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা জাগাতে হবে। অথচ, তার মেয়েটি বাসে করে ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে পড়তে যায়। আর তিনি এ পাড়ার স্থপতিদের একজন। স্থানীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ছিলেন, সাধ্যমত অর্থ দিয়েছেন, চাঁদা সংগ্রহ করেছেন, ছেলে-মেয়েকে বাংলা বিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন। তবুও কোন সম্মান পেলেন না। তিনি কেরানি একেবারেই ব্রাত্যজন। আজ মেঘ মেদুর দিনে বাড়ি নির্মাণের তত্ত্বতালাশ করতে করতে জ্ঞান স্যারের ভাবনা বর্ষাদিনের সঞ্চারিত মেঘের মতোই জলভারে কিছু বিমর্ষ। ভাবছেন, বিষয়টি পেনশন সংগঠনে তুলবেন। তারা যেন গুরুত্ব সহকাকে বঞ্চিত কেরানিকুলের কথা ভাবেন। তিনি ভাবছেন ১ জানুয়ারি ইংরেজি বর্ষ বরণের শুভদিনে হোক কেরানি দিবসের সূচনা। পয়লা তারিখ যেমন নববর্ষের শুরু তেমনি হোক কেরানি দিবসের শুরুয়াত।

আজ বাজার থেকে ফিরে জ্ঞানবাবু স্ত্রীকে ডাকলেন। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে মাধবীলতা স্বামীর সামনে এলেন, বললেন : কি হইছে? ডাকো ক্যান? উদ্বাস্তু জীবনের ৫০-৬০ বছর পার করেও মাধবীলতা দেশের ভাষা ভুলতে পারেন নি। 'আরে একটু বস। আজ একটা কাণ্ড ঘটেছে। ওই যে পাড়ার শুভ আছে না, নাগরিক কমিটি করে, সুন্দর নগর জীবনের জন্য আন্দোলন করে। ও বললো : মেসোমশাই, আজ আপনার বাড়িতে যাবো।' আসতে বলেছি। বলো তো আমার কাছে ওদের কি দরকার।'

'আমি কি কইর‍্যা কমু? চাঁদা টাদা নিব বোধহয়।' জ্ঞানস্যারের ভাবনা যায় না। মিস্ত্রিদের কাজে লাগিয়ে আবার ভাবতে বসলেন।

এমন সময় শুভ ও আরো জনাতিনেক বাইরে থেকে হাঁক পারলো : মেসোমশাই, মেসোমশাই, 'আরে এসো এসো। বসো। বল, কি ব্যাপার।' 'ব্যাপারটা হল, আপনি তো জানেন, প্রতি বছর ২৩ জানুয়ারি আমরা নাগরিক কমিটি থেকে এলাকার প্রবীণদের সম্বর্ধনা দিয়ে থাকি। আপনি তো অবসর নিয়েছেন কয়েকবছর আগে। এবারে আমরা আপনাকে সম্বর্ধনা দেব। আপনি না করবেন না। বিকেলে মাঠে আসবেন। আরো অনেকে থাকবেন।' শুভ থামলো।

জ্ঞানস্যারের রা সরে না। 'গিন্নিকে ডাকলেন' মাধু শোন ওরা কি বলছে।' স্ত্রী মনযোগ দিয়ে শুনলেন, বললেন, 'ভালোই তো। তোমরা চা খাবা। বস, তোমাগো চা দিই।'

'না না মাসীমা, আজ আর চা খাবো না। অনেক বাড়ি যেতে হবে তো। হাতে আর দিন দুয়েক রয়েছে। আজ যাই। মেসোমশাই চারটের সময় চলে আসবেন।'

ওরা সকলেই চলে গেলেন। জ্ঞানবাবু স্তম্ভিত। সন্ধ্যায়র চায়ের কাপ হাতে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছেন, 'বুঝলে মাধু, আজ মনে হচ্ছে আমাদের জীবনও হেলাফেলার নয়। সমাজের সকলেরই প্রয়োজন রয়েছে। অফিসে যেমন কত কত পোস্টে কত কত লোক— কাউকে বাদ দিয়ে অফিস চলে না তেমনি সমাজে জীবনে সকলেই গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। ফুল গাছে যেমন অনেক অনেক ফুল গাছের জীবন সার্থক করে— আমরা তেমনি— সকলকে নিয়েই সমাজ, কেউ বড়-ছোট নয়। এই যে ওরা আমাকে ডাকলো, দ্যাখো, আমি তো কেউকেটা নই— কিন্তু আমরা সকলেই সমাজকে টিকিয়ে রাখি, জীবনকে চলতে সাহায্য করি।'

মাধবীলতা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা শুনলেন। বললেন : হ ঠিকই কইছো। এইতো দ্যাখো না মিস্তিরিরা বাড়ি বানাইতেছে। কেউ দেওয়াল তোলে, কেউ বালি সিমেন্ট মাখে, কেউ মুট বয়। হককলে না হইলে কি আর বাড়ি হয়।'

জ্ঞানবাবু স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তখন অষ্টমীর চাঁদ আকাশে। কিছুটা ঘোলাটে তবু তার আভা এসে পড়েছে বারান্দায়। কাল তিনি সম্বর্ধনা নিতে যাবেন পরিষ্কার জামা কাপড় পরে। ফিরে আসবেন কিছু ফুল, কিছু মিষ্টি, স্মারক নিয়ে। তিনি পুলকিত হলেন। চাঁদের আলো যেন তাদের দু'জনকে ভিজিয়ে দিচ্ছে।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ

জয়শ্রী গুপ্ত

উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য আন্দামান, বারাটাং ও রট আইল্যান্ড এই পাঁচটি দ্বীপ বৃহত্তম। এদের গ্রেট আন্দামান বলে।

আন্দামান ও নিকোবর দুটি পৃথক দ্বীপপুঞ্জ। ১৮৮৮ সালে ব্রিটিশের হাতে সংযুক্তি ঘটে। লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় হাইড্রোগ্রাফার কর্নেল ব্লেয়ার বাংলা থেকে লোকজন এনে চাথামে বসতি গড়েন। সভ্য জগতের আলো পড়ে। ১৮৫৭ সালে শঙ্কিত ব্রিটিশরাজ দণ্ডিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রথম এখানে দীপান্তরে পাঠায়। ১৭শ শতকে মারাঠাদের সঙ্গে সংঘাত ঘটে এ্যাডমিরাল কনৌজি আংরেজের নৌবাহিনীর সঙ্গে— ব্রিটিশ, ডাচ ও পরে পর্তুগীজের দখলে আসে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের দখলে আসে। সেসময়ই রাস্তাঘাট তৈরি হয়। তৈরি হয় বিমান অবতরণ ক্ষেত্র। জাহাজের বন্দর সেজে ওঠে আধুনিকতায়। জপানের প্রধানমন্ত্রী তোজোর ঘোষণায় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় নেতাজীর হাতে। তাঁর হাতে প্রথম জাতীয় পতাকা ওড়ে ৩০ ডিসেম্বর ১৯৪৩ সালে। আবার ১৯৪৫ এ ব্রিটিশের দখলে এবং ১৯৪৭ এ পূর্ণ স্বাধীনতা।

মূলত আদিবাসীদের দেশ। দক্ষিণ আন্দামানের পশ্চিম জুড়ে পাহাড়, বন, হিংস্র জানায়োরের বাস। উত্তর সেন্টিনেলে সেন্টিনেলীজ হিংস্রতায় জারোয়াতুল্য আজও লোকচক্ষুর আড়ালে, সংখ্যাও অজানা।

বর্তমানে আছে কয়েদীদের বংশধর। পূর্ব পাকিস্তানি বাস্তুহারা, সিংহল, বার্মা, তামিলনাড়ু, কেরলের বাসিন্দারাও আছে।

নিকোবর নিকোবরী— কাম্বেল বে তে মঙ্গোলীয়ানদের বংশধর শাম্পেনরা ছাড়াও বেশ কিছু আদিবাসীদের বাস। এদের পৃথক পৃথক দ্বীপ যেখানে সভ্য জগতের আলো নেই। শিকারই জীবিকা।

এবার আসি ভ্রমণের কথায়— আমি ভ্রমণপিপাসু। ভারতকে জানা, তার বাসিন্দাদের চেনা আর বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূপ্রকৃতি দেখা। এ যাত্রায় নিকোবর ছিল না। কুন্ডু স্পেশালে বন্দোবস্ত করে একাই ঘুরি।

তীর্থভূমি সেল্যুলার জেল— প্রথম দিন সকাল সাড়ে সাতটায় প্লেন মাটি ছোঁয় পোর্টব্লেয়ারে ছোট্ট এ্যারোড্রাম। কুন্ডুর ব্যবস্থায় পাঁচটি মারুতিতে আমাদের দল হোটেল ঋষভে উঠি। আমারই মতো একজন একা ভ্রমণপিপাসু আমার রুমমেট হয়। বিদেশও ঘুরেছে। নিবেদিতা বাগচী।

সন্ধ্যায় লাইট এন্ড সাউন্ড দেখতে সেল্যুলার জেলে। এখন জাতীয় স্মৃতিমন্দির, সেল্যুলার জেলের মাঝখানে গোল ওয়াচ টাওয়ার ঘিরে সাতদিকে অক্টোপাসের মতো ধাপে ধাপে সাতটি উইং, যাতে ৭৫৬টি সেল বা বন্দিঘর ছিল। তার চারটি ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সেখানে গোপিবল্লভ হাসপাতাল গড়ে উঠেছে। বন্দিদের মধ্যে সাভারকার, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, মোহন সিং, মুজতবা হোসেন, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল যাঁরা অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেন।

জেলের গেট দিয়ে ঢুকে বাঁদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের চিত্রসহ পরিচিতির মিউজিয়াম। সামনে বিরাট অঙ্গনে সার সার চেয়ার পাতা রাতের প্রোগ্রামের জন্য। যেন জেলের কোনো বৃদ্ধ কয়েদী অত্যাচারে দলিত, তাঁর মুখেই কাহিনী শোনাচ্ছিল। অতি নৃশংস, চোখে জল আসে। কোনো কয়েদী যদি খাটতে খাটতে অপারগ হত বা অরাজী হত তাঁকে উলঙ্গ করে সামনের কাঠগড়ায় উপুড় করে (শিশুর মতো) হাত পা বেঁধে একই স্থানে মারতে মারেত যতক্ষণ না মাংস ফেটে রক্ত ঝড়ত থামত না। পরদিন সকালে দিনের বেলায় সব ঘুরে ঘুরে সেল্যুলার জেল দেখলাম। একজন কয়েদী ঘানি টেনে রোজ পঁচিশ সের তেল বার করতে বাধ্য ছিল। অবাধ্য হলে বা বসে পড়লে শুরু হত মার। যারা প্রতিবাদ করেছে তাদের ঘাড়ের পিছন থেকে ভারী লোহার শিকল বেঁধে সামনে এনে হাত পায়ের সাথে জুড়েছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত না এরকম মূর্তি সামনের পার্কে কয়েকটি। জেলের সেলগুলি পাথরে গাঁথা তিনদিক বন্ধ, সামনের গেট মোটা গরাদ হুড়কো তাও মোটা, টেনে দেওয়ালের গাঁথনিতে তালা দিত যা ভিতর থেকে দেখা যেত না। খাবার বাসন গেলাস লোহার, ফেলে রাখলেই বিষাক্ত। মাটির সরায় মলমূত্র ত্যাগ করে যতক্ষণ না বাইরে আসতে পারত ততক্ষণ ভিতরে ওই নিয়ে থাকতে হত আর নিজেদেরই পরিষ্কার করতে হত। এঁরা সব আমাদেরই ভদ্র ঘরের সন্তান যাঁরা দেশ স্বাধীন করতে নিজেদের উৎসর্গ করেছিল। ফাঁসির ঘরে একসাথে তিনজনকে ফাঁসি দিত, সেল থেকে দেখা যেত। ওই মৃতদেহ দাহ না করে, শেষের ছোট গেট দিয়ে হিঁচড়ে টেনে সামনে অনেক নীচে সমুদ্রে ফেলে দিত। সেল এমনভাবে তৈরি পাশাপাশি কেউ কাউকে দেখতে পেত না। মনটা বিষণ্ণ ভারী নিয়ে বেরোলাম। আজ আমরা স্বাধীন। স্বেচ্ছাচারী, স্বার্থপর, আদর্শহীন হয়ে উঠেছি, করোর কথা ভাবি না।

এরপর শুরু হল নৈসর্গিক ভ্রমণ। সকালে পাঁচটা মারুতিতে পুরো দল প্রথম চাথামে। একটি ছোট মিউজিয়াম, কাঠের নানা কাজ করা প্রাকৃতিক নিজস্ব ডিজাইন রংকে বজায় রেখে নানা মূর্তি ছবি আসবাব। পাশেই চাথামের কাঠের চেরাই কারখানা। ভেতরের লোকেরা খুব যত্ন করে বোঝালো। এরপর নানা অ্যাকোয়ারিয়াম। সামান্যই সামুদ্রিক জীবন্ত মাছ, বেশি তোলা ছবি আর নানারকম কোরাল (প্রবাল)। কোনোটা যেন বাতাস করার ফ্যান, কোনোটা ছোটখাটো শিকড়শুদ্ধ বট গাছ, কোনোটা হরিণের শিং-এর মতো। এরকম কয়েকটি মিউজিয়াম দেখলাম। বিকালে সমুদ্রতীরে গেলাম, ঢেউ কিছুটা পুরির মতো। পাড়ে অনেক কোরাল পড়ে আছে তবে ঝিনুক কোথাও চোখে পড়েনি। বেশ কিছু কুড়োলাম তবে নাকি প্লেনে আনতে দেয় না তাই অল্প এনে আফশোষ হচ্ছিল ফেলে আসায় বাধা পাইনি বলে।

পরদিন ভোর চারটায় বাসে বারাটাঙ্গ (১২০ মাইল)। বেশ ভাল লাগছিল। পরিষ্কার দূষণমুক্ত শহর। রাস্তায় লোক হাঁটতে দেখিনি। (পোর্টব্লেয়ারে পৌঁছে দেখি এ যেন দার্জিলিং। খুব উঁচুনীচু পাকদন্ডী পথ তবে মোটে শীত নেই জানুয়ারিতেও, বাড়িগুলো কংক্রীটের। রাস্তা সব পরিষ্কার, কোনো কুটো নেই জমাদারও চোখে পড়েনি। প্লাস্টিকের ব্যবহার নেই।) একটি বন্দরে নামলাম সেখান থেকে বার্জে চড়ে (যাতে গাড়ি ও বাস তোলা হয়) আরেকটি দ্বীপের বন্দরে নামলাম। সেখান থেকে দুটো ছোট স্টীম বোটে আমরা লাইম স্টোন কেভের দিকে রওনা হলাম। বেশ কয়েক মাইল যাচ্ছি, দ্বীপের ফাঁকে সমুদ্র পরিষ্কার। উত্তাল নয়। দুদিকের তীরেই বড় বড় ম্যানগ্রোভের জঙ্গল। শান্ত যেন প্রকৃতির নিজ রাজ্য, মানুষের হাত পড়েনি। বার্জে

যাবার সময় অবাঙ্গালি কমবয়সী ট্যুরিস্ট জলের খালি বোতল ছুঁড়ে ফেলল আর তা প্রকট হয়ে একা ভাসতে লাগল। তিরস্কার না করে পারলাম না। হঠাৎ দেখি আমাদের বোট যেন বাঁদিকে সুন্দরবনের সরু খাড়িতে ঢুকছে। দুপাশের ম্যানগ্রোভ জড়াজড়ি করে আছে, দাঁড়ালে মাথা আটকে যাবে। দুপাশে ঘন জঙ্গল রোদের আলোর প্রবেশ করে না তবে বাঘ নেই। হরিণ বা ছোট ছোট প্রাণী আছে। এদিকে জারোয়াদের বাস। কিছু কিছু সভ্যতার সুযোগ সুবিধা নিচ্ছে। হিংস্র নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুধারের পাড় সরু হয়ে বন্ধ হয়ে গেল। বোট থেকে নেবে উঁচুনীচু পাথরে রাস্তা, নীচে গাছের শিকড় সাপের মতো পাক খাওয়া, হোঁচট খাবার ভয়। এই রাস্তা দেড় কিলোমিটার। পায়ের দিকে নজর রাখতে রাখতে কখন গুহায় ঢুকে পড়েছি। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে টর্চ জ্বালিয়ে দুধারে দেখি অপূর্ব কারুকার্য। স্টোনের ক্রীষ্টলে কোথাও শঙ্খ, কোথাও গণেশ, ঝাড়লণ্ঠন। এক জায়গায় গোল ফুটো ছাদ থেকে আলো আসছে। এরপর গুহা শেষ। সেখানে নীচে টর্চ দিয়ে দেখি সুড়ঙ্গ, লোকাল গাইডকে বলি 'সাপ থাকে'? বললো হ্যাঁ। নিশ্চয়ই পাইথন? তাড়াতাড়ি হাঁটা দিলাম।

পাশের বসতি সভ্য জারোয়াদের। এরা লোকচক্ষুর আড়ালে থাকে; ভাল করে তাকাতেই ঘরের ভিতর চলে গেছে। বিশেষ অনুমতি নিয়ে আমাদের এখান দিয়ে ফেরা। বাসের গাইড কৃষ্ণর সাথে আলাপ করলাম, ওরই ব্যবস্থায় মারুতি, বাস, বোট জাহাজের টিকিট। জানলাম কলকাতায় মা ভাই আছে। এখানে প্লেনের টিকিট হারিয়ে যাওয়ায় টাকার অভাবে থেকে গেছে। ২২ বছর আছে। বাঙ্গালি বৌ। এখন বেশ অবস্থাপন্ন বুঝলাম। শুনলাম আন্দামানে মিষ্টি জলের উৎস নেই। বাঁধ দিয়ে বৃষ্টির জল ধরে রাখে। মোটা টাকা জমা দিয়ে তবে জল পায়। সব কাজ ওই জলেই। আবার বার্জে বন্দরে ফিরে এলাম এগারোটার আগেই। দুপুরের খাওয়া কুভুর নামাঙ্কিত বাক্সে চমৎকার ফ্রাইড রাইস, চিকেন, একটা আলুর দম, চাটনী, মিষ্টি। জিজ্ঞাসা করায় বললো এখানকার খাবার মুখে দেওয়া যায় না। সারারাত জেগে করেছে। আন্দামানের সব সব্জি-মাছ কলকাতা, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা থেকে আসে। প্রায় ডবল দাম। বিকালে হোটেল ঋষভে ফিরেই চা, স্ন্যাকস লোভনীয়। আমাদের দল খুব মিশুকে, রিসেপশনে বসেই চায়ের সাথে আড্ডা, কেউ গান, নানা গল্প। সবাই যেন কাছের। দু-জন ডাক্তার, একজন মেরিন ইঞ্জিনীয়ার দম্পতি একটি বাচ্চাসহ, বাকিরা বেশিরভাগই বয়স্ক।

পরদিন সকালে জলিবয় আইল্যান্ড— প্রথমে লঞ্চে গিয়ে মাঝ সমুদ্রে গ্লাস বয়ম বোটে নামলাম। নীচে মাথা ঝুকিয়ে স্বচ্ছ জলের তলা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। তলায় নানা মাছ কোরাল সামুদ্রিক শশা দেখলাম। আরও ৫০ টাকা দিয়ে আরও কিছু দূর পর্যন্ত দেখলাম। এখানে প্রায় ফুটবল গ্রাউন্ডের মতো জায়গা অগভীর স্বচ্ছ কাঁচের মতো জল। কোনো তরঙ্গ স্রোত নেই, বাচ্চাদের টিউবে ভাসিয়ে মায়েরাও নেমেছে। আমার ভারী আফশোষ হল চেঞ্জ আনিনি, হোটেলেই স্নান সেরে এসেছি। তীরে ম্যানগ্রোভের জঙ্গল কিছুটা বালিয়ারি। অবাক হাতে তুলে দেখি একেবারে দুধসাদা কোরালেরই গুড়ো। পাড়ে ভাগ করে একটু ঢুকে একটা সিমেন্টের গোল টেবিল আর কয়েকটি বাঁশের বেঞ্চি বোধহয় ভাড়া দেয়। ওখানে খেলাম সব রান্না করে আনা। কোথাও কুকুর পাইনি। তবে বারাটাঙ্গ-এ আর কেভের কাছে রোগা রোগা দু-একটা ছিল। যেন সুন্দর পিকনিক। সর্বদাই ১২টায় লাঞ্চ রাত ৯টায় ডিনার কোনো নড়চড় নেই। যেখানেই থাকি না কেন।

পরদিন রস আইল্যান্ড— খাওয়া সেরে পোর্টে এখানে ১০০/- জমা রেখে ওয়াটার বটল নিতে হয়। প্লাস্টিক বোতল বারণ; ফিরলে ৫/- কেটে বটল ফেরত নেয়, কড়াকড়ি। এটাও সেল্যুলার জেলের উল্টোদিকে। অনেক নেমে পোর্ট, এখানে লঞ্চ। বেশ কিছুটা দিয়ে তবে নামা। বাঁদিকে খোলা সমুদ্র, খুব ঢেউ তাই লঞ্চ এদিক ওদিক কাত হচ্ছে। বুক সমান জল এসে যাচ্ছে। সবাই ভীত কখন লঞ্চ উল্টায়, সবাই লাইফ বেল্ট পড়া। সমুদ্রের তীরের রং সাদা তারপর সবুজ শেষে ঘন নীল। রস সাহেবের নামে এই দ্বীপ। এখানে মিষ্টি জলের উৎস, চারটে কুয়ো আছে। ব্রিটিশরা এখানে চার্চ, ক্লাবঘর, হাসপাতাল, সব গড়েছিলো। সব এখন ভগ্নবস্থা। ছোট্ট পাহাড়ী দ্বীপ একবেলাতেই ঘোরা যায়। দুটো পুকুর আছে। একটায় শাপলা ভর্তি অন্যটায় হাঁস ঘুরছে। জলের স্তর সমুদ্রতল থেকে উঁচুতে। চারিদিকে দৃশ্য সুন্দর। দুটো হরিণ আছে, বিস্কুট খেল। সবাই ফিরে এলাম। প্রতিটি দ্বীপের গঠন, চরিত্র আর সৌন্দর্য আলাদা। এখানেই ব্রিটিশদের প্রমোদের স্থান ছিল।

এবার হ্যাভলকে যাওয়া— ম্যাকক্রুজ ভারী সুন্দর, ভিতর ও বাইরে প্রমোদ তরী। দোতলা। ভিতরে প্লেনের মতো ব্যবস্থা। এক পিঠের ভাড়াই ৭০০ টাকা। ৪৫ নটিকাল দূরে যাওয়া জাহাজ চড়ার শখ মিটলো। কিছুটা গিয়েই খোলা বঙ্গোপসাগর, অসীম সমুদ্র। এ এক অপূর্ব যাত্রা। আস্তে আস্তে ডানদিকে দ্বীপের চিহ্ন দেখা গেল। পোর্টে নামলাম। জলের থেকে অনেক উঁচুতে জেটি। সেখান থেকে জীপে করে রাধানগর বীচ। এখানে স্নান করলাম। বালিয়াড়ি অনেকটা পেরিয়ে বেশ বাদে বাদে বড় ঢেউ, সামনে খোলা সমুদ্র কিছুটা দিঘার মতো। ১০/- দিয়ে স্নান বাথরুম ব্যবহার করা যায়। সব বাসিন্দাই বাঙ্গালী, দেখলে পশ্চিমবঙ্গ মনে হয়। সমতল ধানক্ষেত, কচুগাছ, কলাগাছ আছে। ২২ বছর আগে উদ্বাস্তু হয়ে এসে এক একজনের ভাগে ২০ বিঘা জমি। কঠিন অবস্থা পার করে এরা তীরের কাছে ভাতের হোটেল করেছে। এখানে লোকাল লাঞ্চ করলাম। নিরামিষ, তবে কুণ্ডু মাছ ভাজা এনে ঝোল করে নেয়। তীরের পথে কিছু দোকান। এরা ৭০০ টাকায় কলকাতা যেতে পারে।

পরদিন কলকাতার পথে।

ভাঙতে হবে

অমল কর

এতদিন ধরে আমরা যে বেঁচেবর্তে আছি
এ শুধু প্রাণান্তকর প্রাণ ধারণ
আর নিত্যনৈমিত্তিক যাপন-গুজরান
দিন চলে যায় দিনের মতন
কানাগলি বেয়ে লক্ষহীন গন্তব্যে।
আর এভাবে চলতে থাকে কানে
প্রতিদিনের এক-একটা সমূহ পরাজয়।

যেহেতু আমার ভেতর আমি আর
ভালো থাকতে পারছি না
আমাকেই ভাঙতে হবে চিরচেনা অন্ধকার।
কুলোর মতো ঝিকিয়ে ওঠে
ভাঙতে হবে জীর্ণ বিকলাঙ্গ সমাজ-সংসার
অভিমন্যুর মতো হাজারব্যূহ পেরিয়ে
ভাঙতে হবে বঞ্চনার কালাপাহাড়।

শুঁয়োপোকার খোলস ভাঙলেই
সে এক নান্দনিক সাতরঙা প্রজাপতি—
রাশিরাশি কাশফুলের হাসির মতো
ঈপ্সিত সবপেয়েছির দেশ।

অক্সিজেন পার্লারের জন্য দাতাদের তালিকা
[১০/০৬/১৯ থেকে ৩০/০৯/২১]

ক্রমিক নং	নাম	টাকা	প্যান
	ইতিপূর্বে সংগ্রহ	৯৩০০০/-	
১।	পেলব মুখার্জী	৫০০/-	BGQMPM4908M
২।	বিজন হালদার	২০০/-	×
৩।	গৌতম রায়চৌধুরী (২)	১২০০/-	ACIPR6969H
৪।	শিবানী চৌধুরী	৫০০০/-	AHIPC7419C
৫।	অজিত বর্মন	৩৫০/-	×
	মোট	১০০,২৫০/-	

—ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ—

সদস্য/সদস্যা ও তাদের নিকটবর্তী আপনজনদের জন্মদিন, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ-বার্ষিকি প্রভৃতি বিষয় সামান্য খরচে প্রবীণবার্তায় ছাপানো যেতে পারে। বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন।

১ এপ্রিল থেকে ২০২১ - ২০২২ সালের সদস্যপদ নবীকরণ শুরু হয়েছে। অনতিবিলম্বে সদস্যপদ নবীকরণ ও প্রবীণবার্তার জন্য ৫০/- টাকা জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সকল পাঠক, পাঠিকা, সদস্য/সদস্যা, বন্ধুজনকে 'প্রবীণবার্তা'-য় লেখা পাঠাবার অনুরোধ জানাই। আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, গল্প, কবিতা বা মননশীল প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য পাঠান। অনুরোধ, কাগজের দুদিকে লিখবেন না, অন্যত্র প্রকাশিত লেখা পাঠাবেন না এবং লেখার কপি রাখবেন।

সম্পাদকমণ্ডলী

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় ৭৭ বছর

পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)

২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭

দূরভাষ : ২২৮০ ৪৯৪০/৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০ চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৩১

বাস স্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে

দূরভাষ ঃ ২৪২৫-৪৪৫৪

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী ঃ কবে, কখন-

পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা ১০টাকা (প্রতিবার)

১) ডাঃ উৎপল ব্যানার্জী - অস্থিরোগ (অর্থোপেডিক)- সোমবার সন্ধ্যা ৬টা
২) ডাঃ বৈজয়ন্তী বাউর - সাধারণ স্বাস্থ্য (জেনারেল মেডিসিন)- বুধবার দুপুর ৩টা
৩) ডাঃ প্রদ্যোৎ সূর - স্ত্রী রোগ (গাইনোকলজিস্ট)- বুধবার সন্ধ্যা ৭টা
৪) ডাঃ সৌম্য চ্যাটার্জি - (নিউরো-সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি)- শুক্রবার রাত ৭টা
৫) শ্রীমতী ছন্দলীনা মহাপাত্র - (মেন্টাল কাউন্সিলিং)- শুক্রবার রাত ৭টা
৬) শ্রীমতী অঞ্জলী দাশ - (ফিজিওথেরাপিস্ট)- সোমবার, শনিবার সন্ধ্যা ৬.৩০

** নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে লেখাতে হবে।

কম খরচে সমস্ত রকম প্যাথোলজি

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮টা-১১টা, বিকাল ৭টা-৮টা)

যোগাযোগ ঃ ২৪২৫-৪৪৫৪

Vol : X Issue : VII, 15th October, 2021, PRABINBARTA Postal Regd. NO.-KOL RMS/449/2019-21

Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in